গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১৩ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ নভেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

এবারের নির্বাচনেও ধর্ম ও জাতপাতই ভরসা বিজেপির

তেলঙ্গনায় গিয়ে সম্প্রতি দলিত সম্প্রদায় বলে পরিচিত মাদিগা গোষ্ঠীর নেতাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু হঠাৎ কেন তাঁর এই বিনয়! কারণটা অবশ্যই তেলঙ্গনায় আসন্ন বিধানসভা ভোট। তাঁর দল বিজেপি ২০১৪-র লোকসভা ভোটের আগে দস্তুরমতো ইস্তাহার ছাপিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের গদিতে বসলেই তারা মাদিগা গোষ্ঠীকে এসসি তালিকাভুক্ত করে দেবে। তারপর মোদিজি মসনদে কাটিয়ে ফেলেছেন, আরও ন'টা বছর। এখন ভোটের সামনে তাঁর রাজনৈতিক ঝুলি ঝাড়তে গিয়ে মোদি সাহেব বুঝেছেন দেশের মানুষের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে বলবার মতো কোনও কথাই তাতে নেই, তাই তাঁর মনে পড়ে গেল তেলঙ্গনার পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এই মানুষগুলির কথা!

মোদি সাহেব অবশ্য একটা সত্য নিজের অজান্তেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এ দেশ স্বাধীনতার পর ৭৫ বছর কাটিয়ে তথাকথিত 'অমৃতকাল'-এ উপস্থিত হলেও মানুষের প্রকৃত অবস্থাটি কী! এর সাথে মোদিজির প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকা ন'টা বছরের ফল যুক্ত হয়ে দেশের গরিব দুর্বলতর শ্রেণির মানুষের জীবনকে ক্রমাগত বেশি বেশি করে দুর্বিষহ করে তুলেছে। তা না হলে দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়ে নানা সুবিধার সুযোগ পেয়েও নানা রাজ্যে একের পর এক জাতিগোষ্ঠী আরও পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর তকমা পেতে মরিয়া হয়ে উঠছে কেন? কেনই বা এক গোষ্ঠী এসটি বা এসসি তকমা নতুন করে পেলে অন্য গোষ্ঠী প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে? মণিপুরের জ্বলন্ত উদাহরণ ছাড়াও বহু রাজ্যেই আজ এই অবস্থা।

মোদিজি জানেন, তিনি যতই ঘন্টায় ঘন্টায় বহুমূল্যের রকমারি পোশাক বদলান না কেন, তাঁর শাসিত ভারতের দৈন্য ঢাকতে পারে এত বড় কোনও আবরণই তাঁর কাছে নেই। তিনি জি-২০-র অতিথিদের থেকে দিল্লির ঝুপড়ি আড়াল করতে ত্রিপল খাটাতে পারেন, কিন্তু বিশ্বের ক্ষুধা সূচকে ভারতের নিচের দিকে দৌড় আড়াল করবেন কী দিয়ে? ক্রমাগত কমছে দেশের লেবার ফোর্স পার্টিশিপেশন রেট অর্থাৎ দেশের কর্মক্ষম মানুষের কাজ পাওয়ার হার। বাড়ছে বেকারত্ব। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির কোপে সাধারণ মানুষের দিন গুজরানই কঠিন। মোদিজি বলেছিলেন 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'। অথচ দেশের মানুষ প্রতিদিন দেখছে, তাঁর ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিরা চরম দুর্নীতি

চারের পাতায় দেখুন

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপনের সূচনা

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ৭ নভেম্বর এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ও দলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। বিকালে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রের সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং। সভাপতিত্ব করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। ভিড়ে ঠাসা হলে কমরেড ঘোষ বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণির উপর মালিক শ্রেণির একতরফা আক্রমণের সময়ে লেনিনের শিক্ষাগুলি গভীর ভাবে চর্চা এবং উপলব্ধি করা ও তাকে জীবনে কার্যকর করে মুক্তি আন্দোলনে রূপ দেওয়ার আহ্বান জানান। শতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি হবে ২০২৪ সালের ২১ জানুয়ারি শহিদ মিনার ময়দানে জনসভার মধ্য দিয়ে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে সর্বদা নিজেকে বিচার করা দরকার

কমরেড মানিক মুখার্জী স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জীর স্মরণে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষথেকে ২৬ অক্টোবর মহাজাতি সদনে এক সভা হয়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। দু-জনেরই বক্তব্য এখনে প্রকাশ করা হল।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

কমরেড সভাপতি ও কমরেডস,

আপনারা জানেন, আমরা যখন কোনও স্মরণসভা করি, তা আমাদের কাছে নিছক কোনও অনুষ্ঠান নয়। মাল্যদান, শোকপ্রস্তাব, বক্তব্য— এগুলির কোনওটিই শুধু আনুষ্ঠানিক নয়। যিনি প্রয়াত, দলের নেতাই হোন আর কর্মীই হোন, তাঁকে তো আমাদের দেওয়ার কিছু নেই। তিনি নেওয়া-দেওয়ার বাইরে। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনে কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে কী ভাবে কতটা সংগ্রাম করেছেন, কী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁর সেই সংগ্রামী জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, তাঁর গুণাবলি থেকে কতটা আহরণ করতে পারি— এটাই এই স্মরণসভার একমাত্র তাৎপর্য।

আমাদের দলে আমরা প্রথম মৃত্যুজনিত বেদনার সম্মুখীন হই ১৯৭৪ সালে, যখন তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা, জননেতা, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী প্রয়াত হন। সেই সময়ে এই হলেই আমাদের মহান শিক্ষক, মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। কী ভাবে শোককে, ব্যথা-বেদনাকে দেখতে হয় সেই বিষয়ে আমাদের সামনে একটা গাইডলাইন উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভবিষ্যতে তাঁর নিজের মৃত্যুজনিত ব্যথা আমাদের যখন আঘাত করবে, সেই অবস্থাতেও আমরা যাতে শক্ত হয়ে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াতে পারি, পরবর্তীকালে এই ধরনের আরও মৃত্যুজনিত ব্যথা-বেদনার সামনে যাতে দাঁড়াতে পারি, সেই সম্পর্কে একটি শিক্ষা রেখে যাওয়া। ওই সময়েই তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি'। এখানেই তিনি বলেছেন, নিছক শোকপ্রকাশের, শুধুমাত্র হৃদয়াবেগের কোনও মানে নেই, যদি বিপ্লবী না বোঝে, যে ঘটনায় সে ব্যথা পেল, তার তাৎপর্য তাকে কী করতে বলে। এই কথাটাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে মহান মাও সে তুং-এর উক্তি স্মরণীয়। বলেছিলেন, শোককে শক্তিতে পরিণত করো। এরপর মৃত্যু ঘটেছে কমরেড নীহার মুখার্জী সহ আরও অনেক নেতা-কর্মীর। এখন তো প্রতি সংখ্যা গণদাবীতে দুটো-একটা মৃত্যুর খবর থাকে। তাঁদের কাউকে চিনি, কাউকে চিনি না।

দুয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড মানিক মুখার্জী স্মরণসভা

একের পাতার পর

কিন্তু বুঝতে পারি, এঁরা সকলেই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে লড়াই করে গেছেন। এঁরা আমাদের সঙ্গে একই সাথে ২৪ এপ্রিলের মিটিংয়ে সামিল হয়েছেন। আরও বহু মিছিলে সামিল হয়েছেন। এমনকি গত ৫ আগস্ট ব্রিগেডে মিটিং শুনে গেছেন, এমন কমরেডেরও মৃত্যু ঘটেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে আমাদের দলে যাঁরা গত ৮-১০ বছরের মধ্যে যুক্ত হয়েছেন, যাঁরা কমরেড মানিক মুখার্জীকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার বা চেনার সুযোগ পাননি, এমন বেশ কিছু নতুন ছাত্র-যুবক— তাঁদের জানার জন্য আমি কিছু কথা বলব। শোকপ্রস্তাবে সংক্ষিপ্তভাবে আছে, আমি কিছুটা ব্যাখ্যা করব এবং তাঁর চরিত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য আমাকে আকৃষ্ট করেছে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করেছে, সেগুলি আপনাদের কাছে রাখব।

কমরেড মানিক মুখার্জী বয়সে আমার থেকে খানিকটা এগিয়ে। আমি, কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, আমরা সকলেই কাছাকাছি বয়সের। কেউ একটু এগিয়ে, কেউ পিছিয়ে খানিকটা। কমরেড হিসাবেও আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। এটা পুরানো কমরেডরা জানেন। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, আমাদের দলে কমরেডশিপটাও একটা কথার কথা নয়। মহান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকতাবাদকে সামনে রেখে ব্যক্তিগত স্বার্থ, ঈর্ষা, দ্বেষ-বিদ্বেষ মুক্ত সর্বহারা সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটা আন্তরিক সম্পর্ক— এটাই কমরেডশিপ। এই কমরেডশিপ শুধু একটা দেশের মধ্যেই নয়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেও এই সম্পর্ক আমাদের মধ্যে থাকে, গড়ে ওঠে, এর ভিত্তিতে আমরা লড়াই করি দেশে দেশে। ফলে যখন কমরেড বলি, সেটা শুধু একটা কথার-কথা নয়।

কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে কমরেড মানিক মুখার্জীর পরিচয় আমার আগে। শোকপ্রস্তাবে আপনারা শুনেছেন, ঢাকায় তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষকে দেখেছেন দেশভাগের আগে। কিন্তু বোঝার মতো বয়স তখন তাঁর নয়। এখানেও পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছেন— আমার ধারণা, আমার আগে। আমি ১৯৫০ সালে যখন যুক্ত হই, তখন তাঁকে পার্টিতে দেখি। এটাও আপনারা শুনেছেন, প্রথমেই পার্টি তাঁকে দায়িত্ব দেয় কমরেড শিবদাস ঘোষের গাইডেন্সে আমাদের দলের কিশোর সংগঠন 'কমসোমল' গড়ে তোলার। এই কমসোমলের সদস্য ছিলেন কমরেড প্রতিভা মুখার্জীও। কমরেড বাদল পাল, কমরেড ব্রজগোপাল সাহা— এঁরা সকলেই প্রয়াত, অনেকেই এঁদের নাম জানেন না, কিন্তু এঁরা একসময় খুবই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে গেছেন। এঁদের ইনচার্জ হিসাবে মানিক মুখার্জী কাজ করেছিলেন। ডিএসও গঠনের যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেখানে আমার সাথে যুক্ত কনভেনর ছিলেন কমরেড মানিক মুখার্জী। কিন্তু তিনি পরপর দু'বার টিবিতে ও একবার জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে কিছু দিন প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে পারেননি। তখন টিবির চিকিৎসাও খুব ভাল ছিল না। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ননী গুহ আমাদের পার্টিকে খুব ভালবাসতেন, কমরেড শিবদাস ঘোষকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, তাঁরই চিকিৎসা আর কমরেড শিবদাস ঘোষের সেবাযত্ন— সবকিছু মিলিয়ে উনি সুস্থ হন।

আরেকটা কথা আমি বলব, প্রথম যুগে আমারও একটা লিমিটেশন ছিল, মেলামেশায় একটা আড়ষ্টতা ছিল। কমরেড মানিক মুখার্জীও মেলামেশার সুযোগ পাননি, তাঁরও একটা আড়ষ্টতা ছিল। কিন্তু যখন কমরেড শিবদাস ঘোষ দায়িত্ব দিলেন বুদ্ধিজীবী সংগঠন গড়ার, তিনি বিনা দ্বিধায় দায়িত্ব নিলেন। আমাদের দলে প্রথম দিকে কয়েকজন বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন। কিন্তু তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টি গড়ার কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, এটাকে ভিত্তি করে কোনও সংগঠন গড়ার কথা তখন ভাবতে পারেননি। ১৯৬৩ সালে কিছু অধ্যাপক, সরকারি কর্মচারী এবং কিছু ইঞ্জিনিয়ার পার্টির সাথে যুক্ত হন। সেই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ কমরেড মানিক মুখার্জীকে দায়িত্ব দেন, এঁদের নিয়ে একটা বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন গড়ে তোলার। এটা শুধু একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন— এভাবে বললে আংশিক বলা হবে। এঁদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ত্বগত চর্চা, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হত এবং প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে তিনি আলোচনা করে আসতেন, যা নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা চলত, সকলে মতামত দিতেন। আবার তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষকে সেগুলি রিপোর্ট করতেন। আবার কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই আলোচনাকে গাইড করার জন্য তাঁকে গাইড করতেন। এইভাবে বুদ্ধিজীবীদের একটা সংগঠন গড়ে ওঠে যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা চর্চা হত। কিন্তু তা একটা বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবী সংগঠন ছিল না। এঁরা পার্টির অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন। এঁরা পার্টির প্রোগ্রামে অংশ নিতেন। এঁদের মধ্যে একদল পার্টির ইংরেজি মুখপত্র 'প্রলেটারিয়ান এরা'তে নিয়মিত লেখালেখি করতেন। অন্যান্যরা অধ্যাপক আন্দোলনে থাকতেন। এই সংগঠনটা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড মানিক মুখার্জীর কর্মক্ষমতা, দক্ষতা বিকাশের সূচনা ঘটে যেটা আমি লক্ষ করেছি। 'পথিকৃৎ'-এর উদ্যোগে শরৎসাহিত্য চর্চার একটা আন্দোলন গড়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র এ দেশের ঘরে ঘরে খুবই আদৃত ছিলেন। একটা সময়ে শরৎ-সাহিত্য পড়েনি এমন লোক ভারতবর্ষে ছিল না বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ যাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র মানুষের অন্তরে যতটা প্রবেশ করেছেন, এর আগে কেউ এতটা পারেননি। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রশংসা আছে। কিন্তু একদল বুদ্ধিজীবী, এর মধ্যে তথাকথিত কমিউনিস্টরাও আছেন, যাঁরা বিদ্যাসাগরের অবমূল্যায়ন করেছেন, শরৎচন্দ্রের অবমূল্যায়ন করেছেন। 'শরৎচন্দ্র দরদি কথাসাহিত্যিক', 'শরৎচন্দ্রের মধ্যে সমস্যা আছে সমাধান নেই', 'তিনি মধ্যবিত্ত দোদুল্যমানতার শিকার ছিলেন', 'তিনি বিচ্ছেদ দেখিয়েছেন, মিলন করাতে তাঁর সাহস ছিল না', 'তিনি রসস্রষ্টা, কিন্তু তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না, তত্ত্বব্যাখ্যাতা ছিলেন না'— এইরকম নানা মন্তব্য তাঁরা করেছেন। এর বিরুদ্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষ শরৎচন্দ্রের যথার্থ চরিত্র ও তাৎপর্য কী, তা উপস্থিত করলেন ভারতবর্ষের সামনে, বিশ্বের সামনে। তিনি দেখালেন শরৎচন্দ্র দর্শনের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী এবং তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেইযুগে গান্ধীজির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের পক্ষে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ধর্মীয় চিন্তা, শাশ্বত ঐতিহ্যবাদকে ফাইট করেছেন। নীতিনৈতিকতার মান কী ভাবে অর্জন করতে হয় তা দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র। তিনি দেখিয়েছেন এথিক্যাল মাদারহুড, এথিক্যাল ব্রাদারহুড কাকে বলে। শরৎচন্দ্র সেই যুগের বিপ্লবীদের সামনে শ্রমিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা উত্থাপন করেছেন। শরৎ সাহিত্য কনটেন্টে, ফর্মে, শিল্পনৈপুণ্যে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ— কমরেড শিবদাস ঘোষ এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ নিয়ে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের ছ'টি ভাষণ আয়োজন করেছিল পথিকৃৎ। যেটা আগে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি সংকলন হিসাবে ('শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে') বেরিয়েছিল, সম্প্রতি 'শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও সাহিত্য' নামে পুস্তক আকারে বেরিয়েছে। এই আলোচনা একটা মূল্যবান সম্পদ শুধু সাহিত্যের অর্থেই নয়, দর্শন, জ্ঞানবিজ্ঞান, সর্বহারা সংস্কৃতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের যে ব্যাখ্যা, বক্তব্য তা এই রাজ্যের জেলায় জেলায়, ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে প্রচারের ক্ষেত্রে কমরেড মানিক মুখার্জী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এটা এখানে উল্লেখ করা দরকার। বহু জায়গায় বহু আলোচনা তিনি করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্যকে তিনি নিয়ে গেছেন বিভিন্ন স্থানে।

তাঁর সাথে হিন্দি সাহিত্যিক বিষ্ণু প্রভাকরের যোগাযোগ ঘটে প্রেমচন্দের শতবার্ষিকী করতে গিয়ে। বিষ্ণু প্রভাকর তাঁর কাছ থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শোনেন। শুনে তিনি আকৃষ্ট হন। বিষ্ণু প্রভাকর শরৎচন্দ্রের জীবনী লিখেছিলেন। তিনি বললেন, এই বক্তব্য তো আগে আমি জানতাম না। তা হলে তো আমার পক্ষে শরৎচন্দ্রকে নতুন ভাবে চেনার সুযোগ হত। বিষ্ণু প্রভাকর এই বক্তব্য একটা রেডিও ভাষণে রেখেছিলেন শিবদাস ঘোষের কথা উল্লেখ করে। কমরেড মানিক মুখার্জী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষের শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা উপস্থিত করার ক্ষেত্রে। তিনি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে গোল্ডেন বুক তো বের করেই ছিলেন। পার্টির অন্য বক্তারাও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন কমরেড মানিক মুখার্জী। ১৯৭৫ সালে আমাদের উদ্যোগে শরৎচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয় সমগ্র দেশে। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), সম্পাদক ছিলেন মানিক মুখোপাধ্যায়। দেশব্যাপী এই অনুষ্ঠান হয়।

এখানে আমি আরেকটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। ১৯৭৭ সালে সিপিএম সরকার ঘোষণা করে

পাঁচের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

পুরুলিয়া দক্ষিণ জেলায় দলের কাজের সাথে নানা ভাবে যুক্ত কমরেড মিনতি মজুমদার দীর্ঘ রোগভোগের পর ৬ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। গত শতকের সাতের দশকের শেষদিকে তাঁর স্বামী স্বদেশরঞ্জন মজুমদার চাকরিসূত্রে সাঁওতালডিতে বদলি হয়ে এলে তিনিও সেখানে আসেন এবং দুজনেই দলের কাজকর্মের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। সাঁওতালডি থার্মাল কলোনিতে দলের কাজকর্ম শুরুর ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনেরই ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কমরেড মিনতি মজুমদার যেভাবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এলাকার বিশিষ্ট কর্মী হিসেবে নিজেকে উন্নীত করেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি মহিলাদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তুলে এলাকার রাস্তাঘাট, জল সহ বিভিন্ন দাবি আদায় করেছিলেন। এলাকায় মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। আশেপাশের গ্রামগুলিতে পার্টির কাজকর্ম শুরুর ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। সকলকে ভালোবেসে সহজে আপন করে নেওয়া— এই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ। নিজের ঘর কমরেডদের কাছে অবারিত করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এলাকার সকলের দিদি।

পরবর্তীকালে তিনি পুরুলিয়া শহরে থাকতেন। সেখানেও তিনি দলের মহিলা সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। শেষের দিকে নানা কারণে তিনি দলের কাজে সেভাবে যুক্ত থাকতে না পারলেও পরিচিত সমস্ত কমরেডের খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন যথার্থ শুভানুধ্যায়ীকে।

কমরেড মিনতি মজুমদার লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিকারিঘাটা লোকালের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড জটিরাম কয়াল হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ওই অঞ্চলে দলের সংগঠন গড়ে ওঠার প্রথম পর্বে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ তাঁর নেতৃত্বকারী সংগ্রামী ভূমিকা ছিল। ৮ অক্টোবর দক্ষিণ অঙ্গদবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তাঁর স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড জয়ন্তী মণ্ডল। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রঞ্জিত বায়েন ছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু ও জেলা সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার।

কমরেড জটিরাম কয়াল লাল সেলাম

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (৪)

শ্রমিক শ্রেণির কাছে রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেবলমাত্র শোষকদের প্রতিরোধ দমনের জন্য

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এবার চতুর্থ কিস্তি।

১৮৪৮-১৮৫১ সালের অভিজ্ঞতা

১। বিপ্লবের প্রাক্কালে

মার্ক্সবাদের প্রথম সুপরিণত রচনা 'দর্শনের দারিদ্র' ও 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' গ্রন্থদুটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। এই কারণে বই দুটিতে মার্ক্সবাদের সাধারণ মূলনীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমরা তখনকার সুনির্দিষ্ট বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কিছুটা প্রতিচ্ছবি পাই। তাই এই দুই গ্রন্থের রচয়িতারা ১৮৪৮-১৮৫১ সালের অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত টানার ঠিক আগে রাষ্ট্র সম্পর্কে কী বলছেন সেটা দেখে নেওয়াটা যথাযথ হবে।

'দর্শনের দারিদ্র' গ্রন্থে মার্ক্স লিখছেন: '... বিকাশের গতিপথে শ্রমিক শ্রেণি পুরনো বুর্জোয়া সমাজের পরিবর্তে এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে যেখানে শ্রেণি ও শ্রেণি-বিরোধের অবসান ঘটবে। যেখানে কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতাধারী গোষ্ঠী থাকবে না, কেন না রাজনৈতিক ক্ষমতাই হল বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরে শ্রেণি বিরোধের সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি।' (১৮৮৫ সালের জার্মান সংস্করণ, পৃঃ ১৮২)

শ্রেণি বিলুপ্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রের বিলুপ্তি— এই সাধারণীকৃত তত্ত্বের সাথে এর কয়েক মাস পরে ১৮৪৭-এর নভেম্বরে কমিউনিস্ট ইশতেহারে' মার্ক্স-এঙ্গেলস রাষ্ট্র সম্পর্কে যে ব্যখ্যা দিয়েছেন তাকে মিলিয়ে বুঝলে বোঝাটা সঠিক হবে।

'... সর্বহারা শ্রেণির বিকাশের অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়গুলিকে বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা কমবেশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধের সন্ধান পেয়েছি। বিদ্যমান সমাজের মধ্যে এই সংগ্রাম এমন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়, যখন তা প্রকাশ্য বিপ্লবের রূপ নেয়। এই স্তরে এসে বলপ্রয়োগের দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণিকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণিশাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

'... আমরা আগেই দেখেছি যে, গণতন্ত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করতে সর্বহারা শ্রেণিকে শাসক শ্রেণির পর্যায়ে উন্নীত করাই হল শ্রমিক বিপ্লবের প্রথম ধাপ।

'সর্বহারা শ্রেণি তার রাজনৈতিক আধিপত্যকে কাজে লাগিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির কাছ থেকে সমস্ত পুঁজি ধাপে ধাপে ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রের অর্থাৎ, শাসক শ্রেণি রূপে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণির হাতে ক্রমশ উৎপাদনের সমস্ত উপায়গুলিকে কেন্দ্রীভূত করবে এবং যত দ্রুত সম্ভব সমগ্র উৎপাদন শক্তির ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে।' (১৯০৬ সালের ৭ম জার্মান সংস্করণ, পৃঃ ৩১ ও ৩৭)

এখানে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সবাদের উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলির একটিকে আমরা পাই— তা হল, 'সর্বহারার একনায়কত্ব' সম্পর্কে ধারণা (প্যারিস কমিউনের পর থেকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস এ ভাবেই বলতে শুরু করেছিলেন)। তা ছাড়া এর মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদের 'বিস্মৃত শিক্ষাগুলির' অন্যতম একটিকে আমরা পাচ্ছি, যা রাষ্ট্রের অতি সুন্দর একটি সংজ্ঞা দেয়— 'রাষ্ট্র, মানে হল শাসক শ্রেণি রূপে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণি'।

প্রতিষ্ঠিত সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির প্রচলিত প্রচার ও আন্দোলন সংক্রান্ত লেখাপত্রে রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞা কখনওই আলোচিত হয়নি। তার থেকেও বড় কথা হল একে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। কারণ সংস্কারবাদের সঙ্গে তা একেবারেই খাপ খায় না। 'গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ বিকাশ' নিয়ে প্রচলিত সুবিধাবাদী ঝোঁক ও কূপমণ্ডুক মোহগ্রস্ততার গালে এই কথাগুলো একেবারে কষিয়ে থাপ্পড় বসায়।

সর্বহারা শ্রেণির হাতে রাষ্ট্র দরকার— এ কথা বারবার আওড়ে সমস্ত ধরনের সুবিধাবাদী, উগ্র জাতীয়তাবাদী ও কাউটস্কিপন্থীরা বিশ্বাস করাতে চায় যে এটাই যেন মার্ক্সের শিক্ষা। যদিও তারা যোগ করতে 'ভুলে যায়', প্রথমত, মার্ক্সের মতে, সর্বহারা শ্রেণির একমাত্র এমন রাষ্ট্রই দরকার যা ক্রমবিলুপ্তির পথে চলেছে। অর্থাৎ এমনভাবে তা গঠিত যে তৈরি হওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই বিলুপ্তির পথে যেতে থাকে এবং বিলুপ্ত না হয়ে তার আর কোনও উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, খেটে খাওয়া মানুষের চাই তেমন একটি 'রাষ্ট্র, যেখানে সর্বহারা শ্রেণি শাসক শ্রেণি রূপে সংগঠিত'।

রাষ্ট্র হল বিশেষভাবে সংগঠিত একটি শক্তি, কোনও একটা শ্রেণিকে দমনের জন্য বলপ্রয়োগের সংগঠন। সর্বহারা শ্রেণির কোন শ্রেণিকে দমন করতেই হবে? অবশ্যই শোষক শ্রেণি, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের। শ্রমিক শ্রেণির কাছে রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেবলমাত্র শোষকদের প্রতিরোধ দমনের জন্য। আর একমাত্র সর্বহারা শ্রেণিই সেই দমনে নেতৃত্ব দিতে ও তা কার্যকর করতে সক্ষম। কারণ, শ্রেণি হিসেবে কেবলমাত্র সর্বহারা শ্রেণিই তার জন্ম থেকে ধারাবাহিকভাবে বিপ্লবী। এটাই একমাত্র শ্রেণি যা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং তাদের সম্পূর্ণ উৎখাত করার কাজে সমস্ত মেহনতি জনগণ ও শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম।

শোষক শ্রেণিগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োজন জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থের বিরুদ্ধে নগণ্য অংশের স্বার্থে তাদের শোষণ বজায় রাখার জন্য। শোষিত শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা দরকার সমস্ত প্রকার শোষণের সম্পূর্ণ অবসানের স্বার্থে, অর্থাৎ মুষ্টিমেয় আধুনিক দাসপ্রভু— জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিপুল অংশের জনগণের স্বার্থে।

পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, মেকি সমাজতন্ত্রীরা শ্রেণি-সংগ্রামের বদলে শ্রেণি-সমঝোতার স্বপ্ন আমদানি করে। এমনকি তারা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কার্যক্রমকে এমন রঙিন ভাবে দেখায়— যেন তা সম্ভব শোষক শ্রেণির শাসনকে উচ্ছেদ করার মধ্যে দিয়ে নয়, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন সংখ্যাগুরুর কাছে সংখ্যালঘুর শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে। শ্রেণি-ঊর্ধ্ব রাষ্ট্রের কল্পনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এই পেটি বুর্জোয়া কাল্পনিক ধারণাটি— কার্যক্ষেত্রে যা পরিণত হয়েছে মেহনতি শ্রেণিগুলির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায়— যার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, ১৮৪৮ ও ১৮৭১-এর ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে, দেখা গেছে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও অন্যান্য দেশে বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় 'সমাজতান্ত্রিক'দের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতায়।

মার্ক্স সারা জীবন লড়াই করেছেন এই পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যা বর্তমানে রাশিয়ায় আবার মাথাচাড়া দিয়েছে সোসালিস্ট রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক পার্টিতে। তিনি তাঁর শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্বকে বিরামহীন ভাবে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে রূপ দিয়েছেন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার তত্ত্বে।

বুর্জোয়াদের শাসন ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে পারে একমাত্র সর্বহারা শ্রেণিই। কারণ, যে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সে জীবন নির্বাহ করে সেই অবস্থাই তাকে এর জন্য প্রস্তুত করে, এ কাজ করার সুযোগ ও শক্তি জোগায়। বুর্জোয়ারা যখন কৃষক ও সমস্ত পেটি বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলিকে খণ্ডবিখণ্ডও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে তখন তারা একই সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণিকে করে তোলে সংহত, ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত। সর্বহারা শ্রেণি বৃহৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করে তার জোরে একমাত্র সে-ই পারে সমস্ত মেহনতি ও শোষিত জনগণকে নেতৃত্ব দিতে— যে জনগণের ওপর বুর্জোয়ারা শোষণ, পীড়ন, নির্যাতন চালায়, সর্বহারা শ্রেণির ওপর চালানো শোষণের চেয়ে তা কম কিছু নয় বরং প্রায়শই আরও বেশি। কিন্তু এই অংশের জনগণ নিজেদের মুক্তির জন্য স্বাধীন ভাবে সংগ্রাম চালাতে অক্ষম।

রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নে মার্ক্স শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন, তাতে অনিবার্যভাবেই সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক আধিপত্য, তার একনায়কত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং জনগণের সশস্ত্র শক্তির জোরে তা অবিভাজ্য শক্তিতে পরিণত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণিকে উৎখাত করা সম্ভব একমাত্র তখনই যখন সর্বহারা শ্রেণি শাসক শ্রেণিতে পরিণত হবে এবং বুর্জোয়াদের অবশ্যম্ভাবী মরিয়া প্রতিরোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমস্ত মেহনতি শোষিত জনগণকে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপযোগী করে সংগঠিত করতে সক্ষম হবে।

ক্ষমতার এক কেন্দ্রীভূত সংগঠন, বলপ্রয়োগের এক সশস্ত্র সংগঠন হিসাবে সর্বহারা শ্রেণির রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োজন একদিকে শোষকদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করার জন্য, অন্য দিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার কাজে জনগণের বিপুল অংশকে— কৃষক, পেটিবুর্জোয়া, আধা-সর্বহারা শ্রেণিকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনে।

শ্রমিক শ্রেণির পার্টিকে শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদ শিক্ষিত করে তুলছে সর্বহারা শ্রেণির অগ্রগামী বাহিনীকে। এই অগ্রগামী বাহিনীই ক্ষমতা দখল করে সমস্ত জনগণকে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করতে, নতুন ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করতে ও তাকে সংগঠিত করতে সক্ষম। বুর্জোয়াদের ছাড়াই এবং তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই সর্বহারা শ্রেণি মেহনতি ও শোষিত জনগণের সামাজিক জীবন গড়ে তোলার কাজে শোষিত জনগণের শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও নেতা হতে সক্ষম। বিপরীতে বিদ্যমান সুবিধাবাদ শ্রমিক শ্রেণির পার্টির ভেতর থেকে গড়ে তুলছে এমন সব লোক যারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, মোটা বেতনের শ্রমিকদের প্রতিনিধি, যারা পুঁজিবাদের আমলে ভাল রকম 'গুছিয়ে নিয়েছে', তুচ্ছ স্বার্থের লোভে যারা নিজেদের জন্মগত অধিকারকেই বিসর্জন দিতে প্রস্তুত— এক কথায়, এরা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী নেতা হিসাবে নিজেদের ভূমিকা বিসর্জন দিতেও রাজি।

'রাষ্ট্র মানে শাসক শ্রেণি রূপে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণি'— মার্ক্সের এই তত্ত্বটি ইতিহাসে সর্বহারা শ্রেণির বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে তাঁর সামগ্রিক মতবাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সেই শাসনের পূর্ণ পরিণতি হল সর্বহারার একনায়কত্ব, সর্বহারা শ্রেণি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ।

কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের বিশেষ সংগঠন হিসেবে যদি সর্বহারা শ্রেণির রাষ্ট্রকে দরকার হয়, তা হলে তা থেকে এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, যে-রাষ্ট্রযন্ত্রটা বুর্জোয়ারা নিজেদের জন্য গড়েছিল, আগে তাকে চূর্ণ না করে, ধ্বংস না করে কি তেমন আর একটা সংগঠন গড়ার কথা ভাবা যায়? 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' সোজাসুজি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছে এবং ১৮৪৮-১৮৫১ সালের বিপ্লবের অভিজ্ঞতার সারমর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স ঠিক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। (চলবে)

সংগঠন বিস্তারের কাজেও কমরেড মানিক মুখার্জী সৃষ্টিশীল ভূমিকা রেখেছেন

স্মরণসভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

মূল বক্তব্য প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আপনাদের কাছে রেখেছেন। আমি খুব বেশি কিছু বলব না। কিন্তু স্মরণসভায় কয়েকটা কথা না বললে মনে হয় এটা সম্পূর্ণ হবে না। আমি ছাত্র আন্দোলনের দিনে যখন কলেজে গিয়েছি বা যাচ্ছি অথবা স্কুল জীবনের শেষপর্যায়ে আছি সেই সময় আমাদের প্রিয় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও তৈরি হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখি কমরেড প্রভাস ঘোষ যা বলেছেন, দু-একটা ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আমার ঘটনার সামান্য তারতম্য থাকলেও, ওটা নিয়ে ভাবার কোনও কারণ নেই, কারণ ওটা ফ্যাকচুয়াল। স্মৃতি থেকে আমার যতটুকু মনে পড়ছে তার থেকে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমি যখন ডিএসও করা শুরু করি সেই সময় পার্টি অফিসে কমরেড মানিক মুখার্জীকে প্রথম দেখি। ওনার কথাবার্তা আমার মধ্যে খুবই প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

এখানে যে প্রস্তাব পড়া হয়েছে তা থেকে আমরা জানতে পারলাম কৈশোরেই কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে আসেন তিনি। এরপরে কলকাতায় আসার পর থেকেই টানা সাহচর্য পেয়েছেন তিনি। কমরেড শিবদাস ঘোষের থেকে নেওয়ার সংগ্রামটা তিনি আমৃত্যু চালিয়ে গেছেন। কৈশোর থেকে ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াটা মুখের কথা নয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আয়ত্ত করতে গিয়ে তিনি নিজেকে সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত করেছেন। সেটা আমি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছি যখন আমি আসাম থেকে এখানে কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে আসতাম। এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা তাঁকে সংগঠনের মধ্যেই বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে দেখেছি।

এখানে কমরেড প্রভাস ঘোষ উল্লেখ করে গেছেন, তিনি পার্টির ক্ষেত্রে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা দেখভাল করতেন। সেখানে ছাত্রযুবদের দেখা, পরিণত বয়সের কর্মীদের নানা সমস্যা দেখা ও সমাধান করার কাজ তিনি করেছেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন করতে গিয়েও যাঁরা যুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে পার্টির চিন্তা ও কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তার ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই সংগঠনে যে সব কর্মীরা যুক্ত

হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সুদৃঢ় পার্টি চিন্তা গড়ে তোলা, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট করার কাজটি তিনি সুনিপুণ ভাবে করেছেন।

তাঁকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে আমার দেখার সুযোগ হয় পার্টির সল্টলেক সেন্টারে। আমরা একত্রে সেখানে ৪-৫ বছর থেকেছি। তাঁর চরিত্রের বাঁধুনিটা বিপ্লবী ভাবনার সুরে বাঁধা। বিপ্লবী রাজনীতিকে বোঝার ক্ষেত্রে, তার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের শিথিলতা আমি দেখতে পাইনি। কলকাতা জেলায় কমসোমল প্রথম গড়ে তোলার সময় কমরেড মানিক মুখার্জী কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর সাথে একত্রে ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে থেকে তিনি নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন। বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের সঙ্গে তিনি যেভাবে কাজ করলেন এবং তার ফলে আমরা যা পেলাম, তা এক কথায় অভাবনীয়।

কমরেড মানিক মুখার্জী অতি স্বল্প সময়ে দেশের বাইরে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছেন তা অনবদ্য। বিদেশের বিভিন্ন সংগঠনের যে বার্তা আপনারা এখানে শুনলেন, তাতে তাঁকে নেতা বলে মেনে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে কেউ কেউ তাঁকে মানিক বলেই সম্বোধন করেছেন। তাঁর চরিত্র যে কী রকম প্রভাব ফেলত তার পরিচয় আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পেলাম। অন্য বহু দেশেও তাঁর কিছু গুণগ্রাহী তৈরি হয়েছিল। এর পরে অসুস্থতা সহ বিভিন্ন কারণে তাঁর আর বিদেশ যাওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন একটা ইন্টারন্যাশনাল গড়ে তোলা, যে প্রস্তাবটা পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে রেখেছিলেন, তাঁর সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে কমরেড মানিক মুখার্জী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এক্সপ্লোরেশন শুরু করেছিলেন। এখানে আমি আরও একটা কথা বলতে চাই। কমরেড শিবদাস ঘোষও তাঁকে দিয়ে সংগঠন বিস্তারের যে কাজ শুরু করিয়েছিলেন, মনে করেছিলেন তিনি পারবেন— কমরেড মানিক মুখার্জী সেই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সৃষ্টিশীল ভূমিকা রেখেছেন। এখানে কমরেড শিবদাস ঘোষের চরিত্র তৈরি করার দিকটা, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রকাশ ঘটছে কতটা, কমরেড মানিক মুখার্জীর মধ্য দিয়ে সেটা আমরা লক্ষ না করে পারি না।

এখানে আরও একটি কথা আমার বলা প্রয়োজন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, দোষ-গুণ আপেক্ষিক, সমস্ত সত্যই আপেক্ষিক। তাই কোনও মানুষের দোষ বুঝতে হলে, তাঁর গুণের দিকটা ভাল করে বোঝা দরকার। মানুষের মধ্যে দোষ-গুণ সবই আছে। কিন্তু কাউকে মূল্যায়ন করতে গেলে তাঁর গুণের দিকটা ধরেই তার দোষের মূল্যায়ন করতে হবে। কমরেড মানিক মুখার্জী এমন এক চরিত্র অর্জন করেছিলেন, যে চরিত্রকে আগামী দিনে ভোলা যাবে না। ভুলে যাওয়ার মতো চরিত্র তাঁর নয়। তাঁকে হারিয়ে আমরা যথার্থই শোকার্ত। এ ক্ষেত্রে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে কমরেড শিবদাস ঘোষ যা বলেছেন তা স্মরণীয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন— শোক আমরা কেন পেলাম, সেই শোক আমাদের কী করতে বলে, বিপ্লবীদের কাছে সেটাই হল মূল, বাকি কথা সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছেন। আমার পুনরায় সে সব কথা বলার প্রয়োজন নেই। তাঁর বিপ্লবী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করছি।

ধর্ম ও জাতপাতই ভরসা বিজেপির

একের পাতার পর

করে চলেছেন। তেল, কয়লা, শেয়ার মার্কেটে তাদের জালিয়াতি-দুর্নীতিকে প্রকাশ্যে আনার পরিবর্তে তা ঢাকতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লোপাট করে মোদিজির এবং তাঁর দলের ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিরা একের পর এক বিদেশে পালিয়েছে। আদানিদের পাহাড়প্রমাণ ঢাকতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার। তার জন্য সমালোচকদের জেলে পুরে কিংবা মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে বিজেপি। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে মোদি সাহেবের ঝুলিতে এমন কিছুই নেই যা দেখিয়ে তিনি আবার জনগণের কাছে ভোট চাইতে পারেন। তাঁর পারিষদবর্গ দীপাবলিতে অযোধ্যায় নদীতে ২২ লক্ষ প্রদীপ ভাসিয়েছেন। কিন্তু যে অন্ধকারে তাঁরা দেশকে ঢেকে ফেলেছেন তা দূর হবে কী করে? পরদিনই মানুষ দেখেছে ঘরে রান্নার সংস্থান করতে ওই প্রদীপের অবশিষ্ট তেল সংগ্রহ করা হতদরিদ্র শিশু-কিশোদের ছবি। তাদের মলিন মুখে হাসি ফোটানোর অ্যাজেন্ডা তো মোদিজিদের বাস্তব কর্মে নেই।

তাহলে, একেবারে চলতি সময়ে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কিংবা আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদিজি প্রচার মিটিংয়ে কী নিয়ে গলা ফাটাবেন? তাঁর ঝুলিতে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিদ্বেষ, জাতপাতের বিভেদের তাস ছাড়া আর তো কিছুই নেই। তাই সে অস্ত্রেরই শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি। মণিপুরের পাশের রাজ্য মিজোরামের ভোটে মোদিজি প্রচারে যাওয়ার সাহস করেননি। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলঙ্গনাতে একের পর এক সভায় প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ভাষণের কোনওটিতেই এমন কোনও কথা শোনা যায়নি যাতে বোঝা যায় একটা গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের কাজটা কী? মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর কোনটি দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা ভোট চাইছেন? উগ্র হিন্দুত্ববাদের জিগির, জাতপাত এছাড়া কোনও একটা বিষয়ও তাঁদের মুখে শোনা যায়নি।

আর আগামী ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের নদী তাঁরা পার হবেন কোন নৌকো চড়ে? ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলোকে চাপা দিয়ে ভোট জোগাড়ের জন্য মোদিজির হাতিয়ার ছিল পুলওয়ামায় সেনা কনভয়ে বিস্ফোরণ এবং তাকে অজুহাত করে বালাকোটে বায়ুসেনার হানা। এককালে বিজেপির অতি ঘনিষ্ঠ, এবং জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক কিছুদিন আগে পুলওয়ামা বিস্ফোরণকে কাজে লাগানোর জন্য বিজেপির গেমপ্ল্যান সামনে এনেছেন। তাঁর থেকেই জানা গেছে, এই ঘটনার পরেই রাজ্যপাল হিসাবে সত্যপালজি মোদিজিকে ফোন করায় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এ বিষয়ে এখন চুপ করে থাকো। সেনাবাহিনীর সাধারণ জওয়ানদের জীবনকে ভোটে জেতার দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারে যারা, তারা আগামী নির্বাচনের আগে চমক সৃষ্টি করতে কী ঘটাবে তা এখনই বলা না গেলেও ওদের কার্যধারা বলে ওই ধরনের কিছু চমক আসতেও পারে! অপাতত লোকসভা ভোটের আগে জানুয়ারিতে রামমন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে তাঁরা দেশজুড়ে হইচই বাঁধাতে উদ্যোগী। নরেন্দ্র মোদি সেই উদ্বোধনে রামলালার মূর্তি বয়ে নিয়ে গিয়ে হিন্দুত্বকুলতিলক সাজবেন। সেই ছবি প্রচার করে বিজেপি ভোটের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে নামবে। সত্যপাল মালিকের আশঙ্কা মতো রামমন্দিরে বোমা ফাটিয়ে নতুন ভোট-চমক বিজেপি দেবে কিনা আগে থেকে বলা শক্ত। তবে আদর্শগত দিক থেকে এবং জনজীবনের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে বলার ক্ষেত্রে একেবারে দেউলিয়া বিজেপির সামনে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি ছাড়া অন্য পথ নেই। মনে রাখা ভাল উত্তরপ্রদেশে ২০১৭-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুজফফরনগরে পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছিল এই বিজেপি। যদিও একটা কথা ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বিজেপি নেতারাও তা বুঝতে পারছেন, দেশের মানুষের ক্ষোভের আগুনকে স্তিমিত করা রামমন্দিরের চমক দিয়ে সহজ হবে না। সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের বিভেদের ঝুলি কেড়ে নিলে মোদিজি যে সত্যিই রাজনৈতিকভাবে ফকির হয়ে পড়বেন।

ঘোষণা ঃ বাসদ-মার্ক্সবাদীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার স্বাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় অংশটি অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না।

কমরেড মানিক মুখার্জী স্মরণসভা

দুয়ের পাতার পর

প্রাইমারিতে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেবে। আমাদের দল এর প্রতিবাদ জানায়। ১৯৭৮ সালে ওই সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকার হরণ করে। এর প্রতিবাদে 'শিক্ষাসংকোচনবিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটিতে মানিক মুখার্জী সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। সভাপতি হন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই সময়েই পার্টি তাঁকে দায়িত্ব দেয় এই আন্দোলনে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবীদের সামিল করার। আর আমার উপর দায়িত্ব পড়ে জেলায় জেলায় গিয়ে কর্মীদের আন্দোলনে নামানো— সেটা এখানে উল্লেখযোগ্য নয়। এই সময়ে কমরেড মানিক মুখার্জী শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, এশিয়ার প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, সন্তোষ ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অরবিন্দ বসু, মনোজ বসু, রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, প্রতুল গুপ্ত, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, নীহার মুন্সি— এরকম বহু বুদ্ধিজীবীদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন এবং এই আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝাতে থাকেন। এটা সহজ কাজ ছিল না। মানিক মুখার্জীকে তখন কে চিনত, কে জানত? তখন তাঁর এ রকম পরিচিতি ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে পার্টির বক্তব্য জানা এবং উত্থাপন করা এক নয়। বক্তব্যকে কতটা বুঝতে পেরেছি এবং সেটা সঠিকভাবে উত্থাপন করে অপরকে কনভিন্স করতে পেরেছি, এ অনেক বড় কাজ এবং এই ধরনের সব প্রতিষ্ঠিত মানুষদের কনভিন্স করার চেষ্টা খুব কঠিন ছিল। তখন সিপিএম সরকার খুব শক্তিশালী ছিল। তাদের অধীনেও অনেক শিক্ষাবিদ ছিলেন। আমরা যেমন বোঝাচ্ছি, তাঁরাও বোঝাচ্ছেন। তার মধ্যেই বুঝিয়ে এঁদের এই আন্দোলনের পক্ষে টানার মতো দুরূহ কাজটাই কিন্তু তখন কমরেড মানিক মুখার্জী করেছিলেন। দিনের পর দিন এঁদের কাছে যেতেন, কথা বলতেন, আলোচনা করতেন। বয়সে এঁদের সকলের থেকেই ছোট ছিলেন। এঁনারা প্রতিষ্ঠিত, তিনি প্রতিষ্ঠিত নন। সেই অবস্থায় তাঁদের বোঝানো, তাঁদের জয় করা, তাঁদের ভালবাসা-স্নেহ অর্জন করা, তাঁদের আস্থা অর্জন করা একটা কঠিন সংগ্রাম ছিল। এই সংগ্রামটা তিনি সফলভাবে করেছিলেন এবং এঁরা সকলেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

১৯৭৮ সালে একটা কনভেনশন হয়। তাতে প্রথম কমিটি তৈরি হয়। এরপরে ১৯৭৯ সালের ১৫ জুন আমরা পার্টির উদ্যোগে একটি ঐতিহাসিক আইন অমান্য আন্দোলন করি— সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রত্যক্ষ আন্দোলন। রাজভবনের সামনে লাঠির আক্রমণে বহু মানুষ আহত হন, রক্তাক্ত হন। গোটা রাজ্যেই তার একটা বিরাট প্রভাব পড়েছিল। এখানেও অন্যান্য দাবির সাথে পার্টির পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়েছিল, ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। এরপরে ১৯৮১ সালের ৮ জানুয়ারি ডঃ সুকুমার সেন সহ বুদ্ধিজীবীরা রাজভবনের সামনে অবস্থান করেন। ২৭ জানুয়ারি একটা বড় সম্মেলন হয়। ২ ফেব্রুয়ারি মহাকরণ অভিযান হয়। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসে ১৬ থেকে ২১ পর্যন্ত একটা অভাবনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিন বুদ্ধিজীবীদের আইন অমান্য, তাতে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও ছিলেন। শুধু সুকুমার সেন যেহেতু হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন না, তিনি আসেননি, বাকি সকলেই ছিলেন। হাঁটতে অসুবিধা হত গৌরী আইয়ুব নামের একজন বুদ্ধিজীবীর, তবুও তিনি ছিলেন। তারপর মহিলাদের আইন অমান্য, তারপর শিক্ষকদের আইন অমান্য, তারপর কৃষক-শ্রমিকদের আইনঅমান্য, সবশেষে ছাত্রদের আইন অমান্য। এটা পরপর পশ্চিমবাংলায় ঘটেছিল। গোটা রাজ্যেই শুধু নয়, এই কর্মসূচি ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরপরেও নানা মুভমেন্ট, প্রোগ্রাম চলতে থাকে। ১৯৯৬ সালে ১৭ ডিসেম্বর এক কোটি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আমাদের দলের তরফ থেকে দাবিপত্র জমা দিই। ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পার্টির থেকে আমরা বাংলা বনধ ডাকি। শিক্ষার দাবিতে সফল বনধ হয়। ওই বছরেই ২১ ডিসেম্বর সিপিএম সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয় প্রাথমিকে ইংরেজি ভাষাশিক্ষা চালু করবে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উত্তাল জনমতের চাপে দাবি মানতে বাধ্য হয়। কিন্তু পাশফেল প্রথা তারা চালু করেনি। ফলে আজও বেসরকারিভাবে বৃত্তি পরীক্ষা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করছে।

এই যে বুদ্ধিজীবীদের সামিল করানো, আন্দোলনে নামানো, এঁরা অনেকেই কোনও আন্দোলনেই কোনও দিন নামেননি। স্বাধীনতা আন্দোলনে থাকতে পারেন, পরবর্তীকালে নয়। তাঁদের বুঝিয়ে নামানো, আইন অমান্য করানো প্রত্যক্ষভাবে, যেটা আমি আগেই বলেছি এবং এটা করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যেও খানিকটা পার্টির প্রভাব, বক্তব্যের প্রভাব কমরেড মানিক মুখার্জী ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক-সাংবাদিক সন্তোষ ঘোষের কথা আমি বলব। তিনি কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মানিক মুখার্জীর সাথে ঘনিষ্ঠতার ফলে বহু আলাপ-আলোচনার পর এমন কথাও বলেছেন যে, আমি আমার যৌবনে যদি আপনাদের মতো কমিউনিস্টদের দেখা পেতাম তাহলে আমার বিভ্রান্তি হত না। তিনি রাবীন্দ্রিক স্কুলের মানুষ ছিলেন। শরৎচন্দ্রকে তিনি উচ্চ আসন দিতেন না, বলতেন, শরৎচন্দ্রের মধ্যে হৃদয়বৃত্তি আছে, বুদ্ধিবৃত্তি নেই— এইসব। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য যখন কমরেড মানিক মুখার্জী তাঁর কাছে উপস্থিত করলেন, তিনি তা গ্রহণ করলেন। এই মহাজাতি সদনেই একটা সভায় তিনি বললেন, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আমার আগের চিন্তা ভুল ছিল। আমাদের ধারণাটাই তিনি উপস্থিত করলেন। এই সন্তোষ ঘোষের সাথে আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষের বিরোধ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সন্তোষ ঘোষ ভাষা আন্দোলনের পক্ষে এডিটোরিয়াল (সম্পাদকীয় কলাম) লিখছেন। আনন্দবাজারকে বস্তুত সন্তোষ ঘোষই জনপ্রিয় করেছিলেন। তখন মালিক অশোক সরকার জীবিত। তিনি এর জন্য সন্তোষ ঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ছেলে অভীক সরকার সন্তোষ ঘোষকে কাকা ডাকত। কিন্তু এই অভীক সরকার আমাদের দলের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। ব্যঙ্গ করে বলতেন, কাকা তো এসইউসি-র লোক হয়ে গেলেন। আপনি কি এবার এসইউসি-র পক্ষে লিখবেন? সন্তোষ ঘোষ বিরক্ত হয়ে দু'বার রিজাইন করতে গিয়েছিলেন। অশোক সরকার গিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করেন, কারণ আনন্দবাজারের অ্যাসেট ছিলেন সন্তোষ ঘোষ। ডঃ সুকুমার সেন বলেছিলেন, আমি স্বদেশি আন্দোলনেও ছিলাম না। শিক্ষাই আমার রাজনীতি, তাই আমি এসেছি। সেই সুকুমার সেনকে তাঁর এক ছাত্র— সিপিএমের সাথে যুক্ত এক অধ্যাপক— বললেন, 'স্যার আপনি শেষপর্যন্ত এসইউসি-র ছাতার তলায় গেলেন! ডঃ সেন উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওঁরা তো আমার মাথায় ছাতা ধরেছে, লাঠি তো মারেনি'। তিনি মানিক মুখার্জীকে একদিন বলছেন, 'আপনাদের দলের ছেলেরা চাঁদা তুলছে রাস্তায় রাস্তায়, কই আপনি তো আমাদের কাছে চান না!' মানিক মুখার্জী বললেন যে, আপনার কথা ভাবতে পারিনি। তখন তিনি পাঁচশো টাকা চাঁদা দিলেন দলকে। তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন, বলছেন আমি আচার-বিচার মানি না, আমার ছেলে মানে। কিছু ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে হবে, আপনি তো মুখার্জী, আপনিও মানেন না, কিন্তু আপনি আসবেন। মানে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কটা এমন হয়ে গিয়েছিল। প্রমথনাথ বিশী আমাদের প্রয়াত কমরেড অধ্যাপক সুবীর বসুরায়কে বলেছিলেন, আপনাদের দলের ছেলেমেয়েদের দেখে আমাদের ছোটবেলার স্বদেশি আন্দোলনের কথা মনে পড়ে। তিনি প্রস্তাব দেন, আপনারা প্রাথমিক ছাত্রদের নিয়ে একটা অবস্থান করুন। এটা আমরা করেছিলাম। গোটা রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে দলে দলে প্রাথমিক ছাত্রছাত্রী এনে আমরা অবস্থান করিয়েছিলাম। প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অরবিন্দ নাথ বসু তো আমাদের দলের খুবই কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন। ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের প্রোগ্রাম হচ্ছে, তখন ছাত্রদের পক্ষ থেকে ছাত্রসংগ্রাম কমিটি হয়েছিল। তারাও আন্দোলন করেছে পাশাপাশি। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ছাত্রদের সেই অবস্থানে চলে গেলেন। বলছেন, আমার যৌবনের দিনের কথা মনে পড়ছে। এই যে সমস্ত কর্মকাণ্ড হয়েছে, এ ক্ষেত্রে কমরেড মানিক মুখার্জীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলেই আমি ঘটনাগুলি আপনাদের সামনে রাখলাম।

তারপর অল ইন্ডিয়া কমিটি হল। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতি হলেন জাস্টিস ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার। জেনারেল সেক্রেটারি হলেন সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। কমরেড মানিক মুখার্জী ছিলেন সহসভাপতি। বাস্তবিক তিনিই এই কমিটির কাজকর্ম দেখতেন। তারই ধারাবাহিকতায় এখন তো সেভ এডুকেশন কমিটির নামে এখন মুভমেন্ট হচ্ছে।

এরপরে কমরেড নীহার মুখার্জী তাঁকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেন। বাংলাদেশে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীও দায়িত্ব নিয়েছেন। দু'জনেরই যুক্ত ভূমিকা আছে এখানে। এর আগে লন্ডনে কমরেড মানিক মুখার্জী শরৎ সাহিত্য নিয়ে একটা আলোচনায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিবিসি বাংলায় সেটা ব্রডকাস্ট করেছিল। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস-এ মে দিবস উপলক্ষে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাদের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করত, তাদের ডাকত। এ দেশ থেকে আমাদের এবং নকশালপন্থীদের ডাকত। এর অধিকাংশ মিটিংয়ে কমরেড মানিক মুখার্জী যোগ দিয়েছেন। কমরেড মানিক মুখার্জী জার্মানিতে গিয়ে সেখানে আগেকার যারা কমিউনিস্ট ছিলেন পূর্ব জার্মানির, তাঁদের সাথে যোগাযোগ করে কথাবার্তা বলেছেন। ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডেও তিনি গেছেন। ১৯৯৫ সালে কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন হয়েছিল, বিদেশ থেকে বহু প্রতিনিধি এসেছিলেন। তাতে জাস্টিস কৃষ্ণ আইয়ার সভাপতিত্ব করেছিলেন। ২০০৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক— তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিলেন— তিনি কলকাতার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেই সময়ে নন্দীগ্রাম আন্দোলন চলছে। সেখানেও তিনি গিয়েছিলেন। নেপালে রাজতন্ত্রের অবসানের পর যখন প্রথম নির্বাচন হয়, নেপালের মাওবাদী পার্টি কমরেড মানিক মুখার্জীকে অনুরোধ করে যাতে র‍্যামসে ক্লার্ক সেই ইলেকশনের তদারকি করার জন্য যান। কমরেড মানিক মুখার্জীর অনুরোধে র‍্যামসে ক্লার্ক নেপালে যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরাক আক্রমণ করার উদ্যোগ নিচ্ছে, এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের পক্ষ থেকে কমরেড মানিক মুখার্জী তখন বাগদাদ গিয়েছিলেন। সেখানকার যুদ্ধবিরোধী সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। লেবাননের বেইরুটে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। এই সমস্ত সম্মেলনে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, রাশিয়া, তুরস্ক, ইরাক, সুদান, সিরিয়া, আমেরিকা, কিউবা, বাংলাদেশ সহ আরও কিছু দেশ অংশগ্রহণ করে। লেবাননের সম্মেলনে হিজবুল্লা সংগঠনও ছিল। তাদের প্রতিনিধিদল কলকাতাতেও এসেছিলেন। ওদের এক নেতার এক সন্তান ইজরায়েলের আক্রমণে মারা গিয়েছিল। সন্তানের সেই রক্তাক্ত কাপড় তিনি এখানে দেখিয়েছিলেন। হিজবুল্লার প্রধান কমরেড মানিক মুখার্জীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কমরেড মানিক মুখার্জী সুদান, সিরিয়া, তুরস্ক, কানাডা, কিউবা, ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন। কিম ইল সুং-এর জন্মশতবার্ষিকীতে আমন্ত্রিত হয়ে উত্তর কোরিয়ায় গিয়েছিলেন। সমস্ত জায়গাতেই এক দিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের বার্তা, অন্য দিকে মার্ক্সবাদে কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য অবদানগুলি তিনি উপস্থিত করেছেন। অনেকেই সেই সব পুস্তক সংগ্রহ করেছেন। আরও সংগ্রহ করতে চেয়েছেন। তাঁদের সাথে আলোচনা হয়েছে। এই ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই যে এত দেশে যাওয়া, বিভিন্ন দলের সাথে সংযোগ স্থাপন, তাদের নেতাদের সাথে বৈঠক, তাঁদের আকৃষ্ট করা, তাঁদের প্রোগ্রামে সামিল করানো, তাঁদের মধ্যে আমাদের দল সম্পর্কে আকর্ষণ সৃষ্টি করা, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা সম্পর্কে আকর্ষণ সৃষ্টি করা— এইসব ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য।

তিনি পার্টির কলকাতা জেলা সম্পাদক ছিলেন বহুদিন। রাজ্য পার্টির তরফ থেকে সেক্রেটারিয়েট মেম্বার হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার দায়িত্বে ছিলেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

সভ্যতার কারিগর !

অচেতন মানুষগুলো পড়ে আছে মাটিতে। পা ফেলার জায়গা নেই। এর মধ্যেই কোনও রকমে পা মাটিতে ফেলে চলা। অসাবধানতাবশত কখনও কখনও পা লেগে যাচ্ছে কারও হাতে, কারও পায়ে, কারও বুক ঘেঁষে পা পড়ছে, আবার কখনও কানের ঠিক পাশ দিয়ে পা চলে যাচ্ছে। তবুও যাঁদের গায়ে পা পড়ছে তাঁরা নির্বিকার। কোনও চিৎকার চেঁচামেচি তো দূরের কথা, মুখে শব্দটি পর্যন্ত করছেন না, যে ভাবে মাটিতে পড়ে ছিলেন, সে ভাবেই পড়ে থাকছেন। শক্ত কিছুর উপর পা পড়লে তবেই একমাত্র নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে যে, না কোনও মানুষের উপর পা পড়েনি।

এ চিত্র কোনও যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের না। কোনও মহামারিরও না। এ চিত্র পরিযায়ী শ্রমিকদের ট্রেনে করে কাজে যাওয়ার, বাড়ি ফেরার।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে বাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম। টিকিট ছিল হাওড়া এমএসভিটি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে। রিজার্ভেশন টিকিট। এই রুটে প্রতিদিন হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক যাতায়াত করেন। অথচ ট্রেন মাত্র দু'টি। তাতে জেনারেল কামরার অবস্থাগুলো আর বলছি না। সহযাত্রীদের সাথে কথা বলে জানলাম রিজার্ভেশন কামরার এ হেন চিত্র নিত্য-নৈমিত্তিক।

মানুষগুলোর মুখ দেখে কষ্ট হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ আমার বাবার বয়সী, কেউ আমার ভাই, কেউ বা বোনের মতো। তাঁরা যখন মাটিতে পড়ে আছেন, তখন আমার নরম গদি আঁটা বিছানা যেন গায়ে কাঁটার মতো বেঁধে। আর একবার মানুষগুলোর মুখের পানে চাই। চোখের সামনে এক হকার একজন যাত্রীর মাথায় পা দিয়ে চলে গেল অথচ দুজনেরই ভাবখানা এমন, যেন কিছুই হয়নি। ভাবলে অবাক লাগে, এই সেই মাথা যা লক্ষ লক্ষ বছর বিবর্তনের পথে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের আসনে বসিয়েছে। গড়েছে মানব সভ্যতা। সেই সভ্যতার মূল কারিগররাই আজ তাঁদের হাতে তৈরি সভ্যতার মাটিতে পড়ে। কত বড় অসভ্যতা!

এর সাথে রয়েছে টিকিট চেকারদের দাপট, তোলাবাজি। সরকারি পোশাকে টিকিট চেকাররা জেনারেল টিকিটের যাত্রী এবং টিকিট না থাকা যাত্রীদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে নিয়ে তাঁদের যথেচ্ছভাবে রিজার্ভেশন কোচে থাকতে দিচ্ছে। কী উদ্দেশ্যে, কীসের ভিত্তিতে তাঁরা টাকা তুলছেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁরা তো কোনও উত্তর দিতে পারছেনই না, উল্টে তাড়াহুড়ো করে কোচ ছেড়ে পালাচ্ছেন। এ ভাবে কার্যত সরকারি মদতে অসহায় মানুষদের থেকে তোলা আদায় করছে রেল। অন্য দিকে টয়লেটের সমস্যা, মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা, চার্জার প্লাগ কাজ না করার মতো বিষয়গুলো নিয়ে বারবার টিকিট চেকার সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের অভিযোগ জানালেও তাঁরা কোনও সমাধানই করেননি। মনুষ্যেতর অবস্থার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে বাধ্য করা হচ্ছে যাত্রীদের।

একদিকে বন্দে ভারত নিয়ে প্রচারের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, যেন মনে হয় ভারতের রেল ব্যবস্থার কী অসামান্য অগ্রগতি! কিন্তু উল্টোদিকের এই চিত্র ফুটিয়ে তোলে আর এক অবস্থা। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও রেল ব্যবস্থার এ হাল কেন? রেল বাজেট কমছে কেন? কেন রেলকে বেসরকারিকরণ করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার— এ সব নিয়ে এই মানুষগুলোর কি কোনও ভাবনা আছে? মানুষগুলো বেঁচে থাকে জীবজন্তুর মতোই, যেন খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা ভিন্ন এ মহান জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। এর মধ্যেই কেউ যদি বা একটু ভাবনা-চিন্তা করে তাঁকে চারপাশ থেকে এই ভাবনায় জড়িয়ে ধরে যে, তুমি তো একা, তুমি আর কী করবে? সভ্যতার স্রষ্টাদেরই ভুলিয়ে রাখা হয় তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে।

তবে এ ভাবেই চিরকাল চলতে পারে না। রাতের শেষে ভোর আসবেই, দিনের আলো ফুটবেই। মাটিতে পড়ে থাকা মানুষগুলো চোখ মেলে উঠে দাঁড়াবেই। এটাই যে ইতিহাস নির্ধারিত একমাত্র পথ।

অর্ণব তালুকদার
কলকাতা মেডিকেল কলেজ

কমরেড মানিক মুখার্জী স্মরণসভা

পাঁচের পাতার পর

অনেক দিন। সর্বশেষ কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইওকে তিনি গাইড করেছেন। আরও বহু আন্দোলনে বহু জায়গায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই। এই যে তাঁর ভূমিকা, কাজ, তা নিয়ে এতটুকু আত্মপ্রচার, আমি এই এই করেছি বলে নিজেকে জাহির করা, এতটুকু অহঙ্কার, দম্ভ— কোনও কিছু আমি তাঁর মধ্যে কোনও দিন খুঁজে পাইনি, যেটা খুবই শিক্ষণীয়। আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আমি যে ঘটনাগুলো বলেছি, বহু কমরেডই তা জানেন, যদিও সেইসময় জানতেন না। একত্রে কথা হত, গল্প হত। তখন শুনতাম কাজকর্ম নিয়ে। আমি স্টেট সেক্রেটারি, উনি ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি। কোথাও গেলে কী হল, না হল জিজ্ঞাসা করতাম। এইভাবেই কিছু কিছু জেনেছি। কিন্তু তাঁর আচরণে আত্মপ্রচার, অহঙ্কার, দম্ভ এতটুকুও ছিল না। তিনি আমার আগেই পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন। এই সুযোগ আমরা কেউই পাইনি। যদিও এই নিয়ে তাঁর দুঃখ ছিল। আমি তাঁর কিছু কথা পড়ে শোনাব। কিন্তু আমি রাজ্য কমিটির সেক্রেটারিয়েট মেম্বার, তখনও তিনি সেক্রেটারিয়েটে ছিলেন না। পার্টির প্রথম কংগ্রেসে বয়সেও তাঁর থেকে ছোট, রাজনীতিতেও জুনিয়ার, তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু কমরেড মানিক মুখার্জী নেই। এই নিয়ে এতটুকু তাঁর প্রশ্ন, ক্ষোভ, দুঃখ— আমি কেন নেই, ও কেন আছে, আমি তো ওর থেকে অনেক সিনিয়ার, আমি তো এই করেছি, ওই করেছি, এসব বলা তো দূরের কথা, তাঁর ভাবনার মধ্যেও এ সবের স্থান ছিল না। এগুলি আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, আমি নিজে একবার কলকাতার কর্মীসভায় তাঁর কিছু ত্রুটি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিলাম। ভালোবাসতাম বলেই তো সমালোচনা করেছিলাম। আরেকবার এই মহাজাতি সদনে পশ্চিমবাংলার জেনারেল বডির মিটিংয়ে সমালোচনা করেছিলাম। তারপরেই কিন্তু আমরা একত্রে চা খেয়েছি, গল্প করেছি। তাঁর মধ্যে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার এতটুকু প্রভাব ছিল না। শুধু আমার বলার মধ্যে একটা ইনফর্মেশনের ভুল ছিল, সেটা কারেক্ট করে দিয়েছিলেন। কেন বললে, কেন এরকম করলে, একটু মুখভার হওয়া এসব ছিল না। এসব জিনিস খুবই শিক্ষণীয়।

আজকে এখানে বহু কমরেড আছেন, যদিও রাজ্যের সকলে আসতে পারেননি আমি জানি, না হলে এই হলে স্থান সঙ্কুলান হত না। হলের বাইরে বসে এবং অনলাইনে অনেকে শুনছেন।

তরুণ কর্মীদের উদ্দেশে আমি বলছি, যে গুণগুলির উল্লেখ আমি করলাম সেগুলো আমাদের কাছে শিক্ষণীয়, আপনাদের কাছেও শিক্ষণীয়। আরও একটা কথা আমি উল্লেখ করব। কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুর পর কমরেড নীহার মুখার্জী যখন অসুস্থ, প্রায় মৃত্যুশয্যায়, তখন পার্টির অভ্যন্তরে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় সেই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কমরেড মানিক মুখার্জীকে আমি পাশে পেয়েছিলাম। আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু সেই স্বীকৃতিই আমি আজ এখানে দিতে চাই। আর একটা গুণ, কমরেড মানিক মুখার্জী যে-কোনও কমিটি মিটিংয়ে থাকলে খুব সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য, মূল কথাটা রাখতেন, অল্প কথায় বলতেন। যদি তাঁর কথা অন্য কেউ বলত, তা হলে বলতেন, "ওই কথাটাই আমার কথা, আমি আর আলাদা করে বলতে চাই না।" অনেকের ক্ষেত্রে হয়, তাঁর কথাটা কেউ বলার পরও বক্তা আবার একই কথা বলতে থাকেন। অনাবশ্যক কথা বলার অভ্যাস তাঁর ছিল না। নিজের কথা অল্প কথায় বলতেন, মূল কথাটা সহজ ভাষায় বলতেন। কমরেডরা ভুল করলে, অন্যান্যরা সাধারণত রাগারাগি বা বকাবকি করতেন, তিনি সহজে সেই কমরেডদের ত্রুটি ধরিয়ে দিতে পারতেন। তিনি খুব অ্যাপ্রোচেবল ছিলেন, যে কোনও কর্মী তাঁর কাছে নির্দ্বিধায় যে কোনও বক্তব্য, যে কোনও সমালোচনা এমনকি তাঁর সম্পর্কেও সমালোচনা ব্যক্ত করতে পারতেন।

আমি, কমরেড মানিক মুখার্জী ও কমরেড মুবিনুল হায়দার, বয়সে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও প্রথম দিকে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। পরে কর্মসূত্রে সবাই আলাদা হয়ে গেলাম। ৪৮ লেনিন সরণির অফিসে কমরেড শিবদাস ঘোষ একটার পর একটা নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। আমরা তখন ছোট। আমরা অনুপ্রাণিত হতাম। অফিস থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেডের ট্রাম ডিপোর ওখানে যেতাম। বাদাম কিনে বসতাম আর ওই বয়সে রোম্যান্টিক স্বপ্ন দেখতাম যে, আমরা ভবিষ্যতে পার্টির জন্য কে কী করব। এরপর কমরেড হায়দার খিদিরপুরের দিকে চলে যেতেন লাস্ট ট্রামে, আমি দক্ষিণ কলকাতা চলে যেতাম, কমরেড মানিক মুখার্জীও উত্তর কলকাতা চলে যেতেন। আবার আমি, কমরেড মানিক মুখার্জী ও কমরেড হায়দার শেষবারের মতো একত্রে মিলিত হয়েছিলাম সল্টলেকে। যখন তিনি পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত। ২০১১ সাল থেকে এই রোগে তিনি আক্রান্ত, যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত কমরেড মানিক মুখার্জি পাবলিক প্লেসে বক্তব্য রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনেকের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করত। ২০১৬ সালে এআইডিওয়াইও-র একটা প্রোগ্রাম এবং ২০১৭ সালে পথিকৃৎ অথবা অন্য কোনও একটি সংগঠনের প্রোগ্রামে অসুস্থতাজনিত কারণে তাঁর স্মৃতি ভাল কাজ করছিল না, একই কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। এরপর আর পাবলিক প্লেসে তিনি বলতে পারেননি। ২০১৫ সাল পর্যন্তই তিনি সাবলীল ভাবে বক্তব্য রাখতে পেরেছিলেন। কয়েক বছর আগে কমরেড হায়দারকে নিয়ে যখন ওনার সাথে দেখা করতে গেলাম তখন উনি অসুস্থ। উনি বললেন, "পার্টি আমাকে দেখছে, খরচ করছে, ওষুধপত্র দিচ্ছে, দেখাশোনা করার লোক দিচ্ছে, কিন্তু কিছুই তো আমি করতে পারছি না। এইভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী?" আক্ষেপ করেছিলেন। আমাদের যা বলার আমরা বলেছিলাম। বাস্তবিকই, যে মানুষ কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা বহন করে পুরো বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছেন, শেষদিকে সেই মানুষকে বাথরুম যেতে, স্নান করতে, খেতে, সমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ করতে, উঠতে-বসতে অন্যের সাহায্য নিতে হত। পরবর্তীতে ডিমেনসিয়া রোগেও আক্রান্ত হলেন। স্মৃতি ঠিক মতো কাজ করছিল না। মাথার কিছু সেল নষ্ট হল। আকস্মিক কিছু অস্বাভাবিক ও অসংযত আচরণ করে ফেলতেন। চলতি বছর ৭ সেপ্টেম্বর প্রথম নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হন। সে বারেই আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দিয়ে কোনও ক্রমে বাঁচানো সম্ভব হয়। পরের বার আর বাঁচানো গেল না। সুগার ফল করল। রক্তে শর্করার মাত্রা পঞ্চাশের নিচে চলে গিয়েছিল, তার সাথে ভীষণ শ্বাসকষ্ট ছিল। অতি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হার্ট ফেল করে মারা গেলেন।

এখন কমরেড মানিক মুখার্জী কমরেড শিবদাস ঘোষ সম্পর্কে ২০১৫ সালে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার কিছু আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি— *"কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্যে আমরা যে থেকেছি, কতটুকু তাঁকে বুঝতে পেরেছি, জানতে পেরেছি! আজকে ভাবি, বহু সময় ওনার সাথে থেকেছি, আরও বহু কিছু জানতে পারতাম। কিন্তু সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছি। ভাল করে জানতে পারিনি। খুবই ছোট বয়স থেকে আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে একত্রে থেকেছি। দুপুরবেলায় সেন্টারে, কমিউনে মাদুর বা পাটি পেতে শোওয়া হত। ভাল বিছানা ছিল না। যে ভাবে উনি থাকতেন আপনারা আজ কল্পনা করতেও পারবেন না। একটা মাদুর বা পাটি বিছিয়ে শুয়ে থাকতেন। আমরা এসেছি, বলতেন, 'পাশে শোও'। বালিশ ছিল না, পাশবালিশটা লম্বা করে ওনার পাশে শুয়ে পড়তাম। এইভাবে ঘনিষ্ঠভাবে জানা, বোঝা, থাকা, খাওয়া, ওঠা-বসা-শোওয়া সবই করেছি, কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে একটা বিরাট গ্যাপ থেকেই গেছে। ওনাকে কি ঠিক বুঝতে পেরেছি? কতটা বুঝতে পেরেছি? কমরেড ঘোষ যখন পরবর্তীকালে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কমিউনে তখন খাওয়া-দাওয়া অতি সাধারণ। ওনার জন্য*

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড মানিক মুখার্জী স্মরণসভা

ছয়ের পাতার পর

কোনও ভাল ডায়েট, পুষ্টিকর খাদ্য আমরা তখন সংগ্রহ করতে পারিনি। ডাল-ভাত যা হয়েছে তিনি আমাদের সাথে খেয়েছেন হাসিমুখে, গল্প করে, আনন্দে। এইভাবে আমরা একত্রে থেকেছি।

কমরেড ঘোষ যে কথাটা বারবার বলতেন, 'দেখো আমরা স্বেচ্ছায় একটা জীবন বেছে নিয়েছি— বিপ্লবী রাজনীতির জীবন। এই জীবন মানেই কৃচ্ছসাধন করব, এটা আমাদের ফিলজফি নয়। যদি জোটে ভাল খাব, যদিনা জোটে আলুসিদ্ধ ভাতটাই খাব। কিন্তু এই যে পেলাম না, আলুসিদ্ধ খেলাম, এটার জন্য যেন আমাদের কোনও মনস্তাপ না থাকে যে, আমরা এটা খেতে পাইনি। বিপ্লবীদের খাবার জুটতে পারে, নাও জুটতে পারে। যদি ভালো খাবার জোটে, তৃপ্তি সহকারে খাব। আর যদি না জোটে, আলুভাতে-ভাত তৃপ্তি সহকারে খাবো।' একটা বিরাট সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। কমরেড ঘোষ আমাদের কাছে একজন বিশাল মাপের মানুষ ছিলেন, এটা আপনারা বুঝতেই পারেন। কিন্তু এত সহজে এমনভাবে আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন যে কোনও দিন মনেই হয়নি উনি একজন বড় মানুষ, আমাদের থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র, আলাদা। এটা কখনও বুঝতে পারিনি। বারবার এ কথাটা আমার মনে হয়েছে— তাঁকে বুঝেছি কতটুকু? বাইরে থেকে দেখা আর সত্যিকারের বোঝা আলাদা। গভীরে গিয়ে দেখা, গভীরে গিয়ে জ্ঞানের নিরিখে বোঝা— এই জায়গাটা খুব একটা আমরা করতে পারিনি। বাইরে যাওয়ার আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাতে দেখেছি, শিবদাস ঘোষের এসব বই পড়ে অনেকে আমাকে অভিযোগ করেছেন যে, 'এগুলো আপনারা আগে নিয়ে আসেননি কেন? ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ডে, বিদেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্যের পরিচিতি করাননি কেন? আমরা তো জানতাম না এত বড় চিন্তানায়ক ছিলেন তিনি'— এই অভিযোগ শুনতে হয়েছে, এই অভিযোগ মাথা পেতে নিতে হয়েছে। আমরা তাঁর খুব কাছেই ছিলাম। আজ আপনারা এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই করতে পারেন যে কতটুকু তাঁর থেকে নিতে পেরেছি? প্র্যাকটিক্যালি বিশেষ কিছু নিতে পারিনি। তাঁর জীবন থেকে খুব বিশেষ কিছু শিখেছি এ রকম মনে হয় না। আজ বয়স হয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবি, এই যে তিনি সারা জীবন একটা ব্যাচ অফ রেভেলিউশনারি তৈরি করার জন্য প্রাণপাত করে গেলেন, পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য ভেঙে গেলেও এই যে চেষ্টা করে গেলেন, আমরা তার থেকে কতটুকু নিলাম? কতটুকু নিজেদের তৈরি করতে পারলাম?"

এই ব্যথা, এই আক্ষেপ ২০১৫ সালে কমরেড মানিক মুখার্জী ব্যক্ত করেছেন। এখানে উল্লেখ করা নেই এ রকম একটি ঘটনাও আপনাদের কাছে বলতে চাই। এতে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি দিকের পরিচয় আপনারা পাবেন। যখন কমরেড মানিক মুখার্জীর জন্ডিস হয়েছিল, সেই সময় একদিন পার্টির একটি কালেকশনের প্রোগ্রাম (অর্থসাহায্য সংগ্রহের কর্মসূচি) পড়েছিল। সমস্ত কমরেডদের কালেকশনে চলে যেতে হবে। সেই সময় অসুস্থ মানিক মুখার্জীকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর শরবত করে খাওয়াতে হত। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন 'তোমরা যাও'। কমরেডরা প্রশ্ন করল, কমরেড মানিক মুখার্জীকে কে দেখবে? উনি বললেন, 'ও একদিন শরবত না খেলেও চলবে, তোমরা যাও।' কমরেডদের পাঠিয়ে দিলেন। তারপর কমরেড মানিক মুখার্জী দেখছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ শরবত তৈরি করে তাঁর জন্য নিয়ে আসছেন। এইসময় সবার জন্য যে রান্না হত সেটা কমরেড মানিক মুখার্জীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক ছিল না। সব্জি কেটে রান্না করে কমরেড ঘোষ নিয়ে আসতেন। এই ছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। শুধু ওখানকার কমরেডদের প্রতিই নয়, সকল কমরেডের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল।

কর্মীদের সবার ঘরে একটা ছবি আছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ সহ সাত জন নেতার ছবি। এঁরা পার্টির প্রথম ব্যাচ, এঁরা প্রত্যেকেই প্রয়াত। দ্বিতীয় ব্যাচ কমরেড তাপস দত্ত, কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী, কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত, কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত, কমরেড অনিল সেন, কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী, কমরেড বাদশা খান, এঁরাও প্রয়াত। তৃতীয় ব্যাচ বলতে কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরি এবং আমি। দু'জন প্রয়াত, আমি এখনও আছি। আমার কাছাকাছি কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, মাত্র দু'বছর পিছনে আছেন। তিনিও এই তৃতীয় ব্যাচের মধ্যেই পড়তে পারেন। আর এখানে যাঁরা আছেন পলিটবুরো সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য— বেশিরভাগই আশির কাছাকাছি, মিড সেভেন্টি-মিড সিক্সটি। ফলে দলের যারা যুবকর্মী, ছাত্রকর্মী তাদের উদ্দেশে আমি বলছি, গত ৫ আগস্ট যা বলার আমি বলেছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের উক্তি পড়ে শুনিয়েছি, কী ভাবে এই পার্টিটা গড়ে উঠেছে। আজ পার্টির ব্যাপ্তি বিরাট। ভারতের ২৬টি রাজ্যে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি এবং খুব বিনয়ের সঙ্গে আমরা বলতে পারি পার্টির শক্তিতে সিপিএমের ঠিক পরেই আমরা। একমাত্র লিবারেশন আরজেডির হেল্প নিয়ে বিহারে খানিকটা শক্তি রাখে। সিপিএমের লোক বেশি, কিন্তু অধিকাংশই নিষ্ক্রিয়, হতাশাছন্ন। সিপিএম, সিপিআই নির্বাচনী রাজনীতির গড্ডলিকা স্রোতে ভাসতে ভাসতে লেফট লাইনটাও ছেড়ে দিয়ে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এখন কংগ্রেসের সঙ্গে চলে গেছে। এ আপনারা জানেন। ভারতবর্ষের লেফট মাইন্ডেড পিপল, সৎ বাম-মনস্ক মানুষ, প্রো-কমিউনিস্ট মাইন্ডেড পিপল যাঁরা এবং যাঁরা অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট পিপল, লিবারেল পিপল তাঁরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। যে নেতাদের কথা বললাম তাঁদের বয়স অনেক। প্রাকৃতিক নিয়মেই তাঁরাও একদিন থাকবেন না। ইয়ং কমরেডরা যদি না দাঁড়ান, নিজেদের তৈরি না করেন, আদর্শগত ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার চর্চা ও তা আয়ত্ত করার সংগ্রাম না করেন তা হলে সমূহ বিপদ।

আমি শেষ মিটিংয়ে বলেছি, বিপ্লবীরা উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনও কাজ করে না। খাওয়া, শোয়া, গান, বৈঠক, গল্প, দলের কাজ, সিনেমা দেখা, নাটক দেখা সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা উদ্দেশ্য থাকবে। লক্ষ্যহীন কোনও কাজ, বিপ্লবের স্বার্থের প্রয়োজনীয় কোনও কাজ ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা, কোনও কাজ করবে না। মোবাইল দেখাটাও যদি বিপ্লবের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তবেই দেখবে। পড়াশোনার চর্চা গোটা দেশে মরে গেছে, জ্ঞানের স্পৃহা মরে গেছে। এই চর্চার মনকে পুঁজিবাদ ধ্বংস করেছে, এই পার্টিগুলি ধ্বংস করেছে ব্লাইন্ডনেস ডেভেলপ করার জন্য (অন্ধতা বাড়িয়ে তোলার জন্য)। এর বিরুদ্ধেআমাদের কমরেডদের স্ট্রাগল করতে হবে। আমাদের যে নতুন ছেলেমেয়েরা, কর্মীরা আসছে তাদের সততা, নিষ্ঠা আছে। কিন্তু আবার তাদের উপর পরিবেশের প্রভাব আছে। ফলে প্রতিদিন পড়াশোনা করা, জানা, বোঝা দরকার। শুধু পড়া মুখস্থ করা নয়, আত্মস্থ করা, নিজের জীবনে তাকে প্রয়োগ করা, জীবনকে পাল্টে ফেলার সংগ্রাম করা— এসব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা বেশিরভাগই পেটিবুর্জোয়া পরিবার থেকে এসেছি। পেটিবুর্জোয়া চরিত্র নিয়ে বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করা চলে না। ফলে আমাদের জীবন যাপনে, আচরণে কোথায় কেমন করে বুর্জোয়া চরিত্র, পেটিবুর্জোয়া চরিত্র কাজ করছে সবসময় দেখা দরকার। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে সবসময় নিজেকে বিচার করা দরকার। ক্রমাগত নিজেকে পাল্টানো, ক্রমাগত নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই স্ট্রাগল আমাদের করা দরকার।

আমাদের দেশে তো এই অবস্থা। বিশ্ব কমিউনিস্ট মুভমেন্টেও চূড়ান্ত সংকট চলছে। আমাদের কাছে সব খবর নেই, কোথাও কেউ হয়ত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে। সোভিয়েতের পতন, চিনের পতনের পর অন্যান্য পার্টিগুলো ভেঙে তছনছ হয়ে গেল, কিন্তু আমরা ভাঙিনি। আমরা দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু আমাদের হতাশা আসেনি। কারণ কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত করে গেছেন। ফলে ভারতবর্ষে বিপ্লব করাই শুধু আমাদের একমাত্র দায়িত্ব নয়, আন্তর্জাতিক বিপ্লবও আমাদের দায়িত্ব। আমরা যারা এখানে আছি, হয়ত কেউ থাকব না, কিন্তু যারা এখানে ইয়ঙ্গার জেনারেশন (তরুণ প্রজন্ম) 'কমসোমল' যারা আছে, ছাত্রসংগঠন ও যুবসংগঠনের যারা আছে, আরও বেশি করে আগামী দিনে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই পার্টিকেও পুঁজিবাদ আক্রমণ করছে। পুঁজিবাদ শুধু গোলাগুলি লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে না। পুঁজিবাদী ভাবধারা, সংস্কৃতি, আর্থিক লোভ, সম্পত্তির লোভ, টাকা-পয়সার লোভ, আরামপ্রিয়তা, আরামে থাকার মানসিকতা, সন্তানের প্রতি দুর্বলতা, স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতা, স্বামীর প্রতি দুর্বলতা— এ রকম নানা ভাবে অতি সূক্ষ্ম আক্রমণ করে। কমরেড শিবদাস ঘোষ এ সম্পর্কে বারবার সতর্ক করে গেছেন।

কমরেড মানিক মুখার্জী তাঁর উপর অর্পিত সমস্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন, সংগ্রাম করে গেছেন। আজ কমরেড মানিক মুখার্জীকে স্মরণ করতে গিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যাতে আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের যথার্থ ছাত্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারি, নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি এবং তাঁর আচরণ দ্বারা যেসব শিক্ষাগুলি আমাদের সামনে তিনি রেখেছেন সেগুলিও যেন আমাদের জীবনে আমরা রক্ষা করতে পারি। এটা হবে তাঁর প্রতি আমাদের

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

কলকাতায় এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর টালিগঞ্জ-১ আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সুভাষ নাগ দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৩ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

স্বদেশি আন্দোলনের আবহে কৈশোর-উত্তীর্ণ সুভাষ নাগ বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। হাওড়ার তৎকালীন জেলা সম্পাদক কমরেড শঙ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি এস ইউ সি আই (সি)-র চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। এক সময় হাতিবাগানে কাপড়ের দোকানে কাজ করাকালীন দলের উদ্যোগে দোকান-কর্মচারীদের সপ্তাহে একদিন ছুটির দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং দাবি আদায় করেন।

পরবর্তীকালে তিনি হাওড়া থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং প্রথমে যাদবপুর আঞ্চলিক কমিটি ও পরে টালিগঞ্জ লোকাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। বাসস্থান সংলগ্ন একটি ছোট্ট ছাপাখানাই ছিল তাঁর আয়ের একমাত্র উৎস। কিন্তু দলের প্রয়োজনে বিশেষ করে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র প্রয়োজনে নিজের ব্যক্তিগত অর্থ খরচ করেও রাত জেগে বহু লিফলেট তিনি ছাপিয়ে দিয়েছেন। ছোটদের প্রতি তাঁর ছিল অনাবিল স্নেহ।

তাঁর বাড়ি ছিল সমস্ত কমরেডের জন্য অবারিত। পরিবারের সকলকে দলের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস অত্যন্ত শিক্ষণীয়। কমরেড সুভাষ নাগের দীর্ঘ জীবনে অনেক টানাপোড়েন ছিল, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই দলের কাজ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। কমরেড সুভাষ নাগের মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড সুভাষ নাগ লাল সেলাম

বাঁকুড়া জেলায় দলের দীর্ঘদিনের দরদি সমর্থক প্রবীণ কমরেড মনোজ ব্যানার্জী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৪ অক্টোবর বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও বাঁকুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল সহ উপস্থিত অন্যান্য কমরেডরা মরদেহে মাল্যদান করেন।

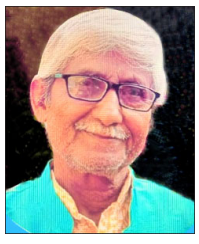

প্রয়াত কমরেড প্রথম জীবনে হুগলির শ্রীরামপুরে থাকাকালীন দলের কাজকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে প্রশাসনিক বিভাগে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। দলের কর্মীদের প্রতি তাঁর যথার্থ ভালবাসা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন ঘনিষ্ঠ সমর্থককে হারাল।

কমরেড মনোজ ব্যানার্জী লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষে ৭ নভেম্বর সকালে দলের শিবপুর সেন্টারে মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড প্রভাস ঘোষ

৭ নভেম্বর বিকালে মৌলালি যুবকেন্দ্রে মহান লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষের সূচনা অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং। সভাপতিত্ব করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি অনলাইনেও সম্প্রচারিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির দাবি পরিচারিকাদের

গৃহ পরিচারিকাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনা, সপ্তাহে এক দিন সবেতন ছুটি, কর্মক্ষেত্রে সম্মানজনক পরিবেশ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, রেশনে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল ও গম, বিনামূল্যে কেরোসিন তেল সরবরাহ, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও শিক্ষা, মদ ও মাদকদ্রব্যের প্রসার বন্ধ, গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ডিজিটাল মিটারের পরিবর্তে স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির নেতৃত্বে ৬ নভেম্বর কলকাতায় সহস্রাধিক পরিচারিকার এক মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে এসপ্ল্যানেডের ওয়াই চ্যানেলে পৌঁছলে সেখানে সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এক প্রতিনিধিদল হাজার হাজার পরিচারিকার স্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সম্মেলন

স্বাস্থ্য পরিষেবা ও মেডিকেল শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে এবং মেডিকেল এথিক্সের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সর্বদাই আর্ত মানুষের সেবায় ব্রতী হওয়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে। কর্ণাটকের বাঙ্গালোর মেডিকেল কলেজ ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (বিএমসিআরআই) ৪ ও ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আট শতাধিক ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকেল স্টাফ, মেডিকেল ডেন্টাল-প্যারামেডিকেল-নার্সিং ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন কালবুর্গী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এম ভি নাডাকার্নি। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রফেসর ডাঃ বিনায়ক নারলিকার। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বিএমসিআরআই-এর ডিরেক্টর কাম ডিন ডাঃ রমেশকৃষ্ণ কে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ক্রিটিকাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফারুক উদয়াদিয়া, নিমহ্যানস এর অধ্যাপক ডাঃ শেখর পি শেষাদ্রি, সেন্ট জোসেফ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডাঃ ভিক্টর লোবো, বিএমসিআরআই-এর প্রিন্সিপাল ডাঃ অসীমা বানু, সংগঠনের সহসভাপতি ডাঃ তরুণ মণ্ডল এবং ডাঃ অশোক সামন্ত, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা প্রমুখ। সংগঠনের সর্বভারতীয় মুখপত্র হেলথ স্পেকট্রা উদ্বোধন করেন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের পূর্বতন বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডাঃ ইউ এন সরকার। সায়েন্টিফিক সেশনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ডাঃ কাফিল খান। বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত কার্ডিওভাসকুলার বিশেষজ্ঞ ও গবেষক ডাঃ সি এন মঞ্জুনাথ। আমেরিকা, আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। স্বাস্থ্য বাজেট হ্রাস, সার্বিক কর্পোরেটমুখিতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন, চিকিৎসক, ডাক্তারি ছাত্র, নার্সদের নানা সমস্যা সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং প্যালেস্টাইনের হাসপাতালে ইজরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রফেসর ডাঃ বিনায়ক নারলিকারকে সভাপতি ও ডাঃ ভবানীশঙ্কর দাসকে সাধারণ সম্পাদক করে ৬১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়।

কমরেড মানিক মুখার্জী স্মরণসভা

সাতের পাতার পর

যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

এখানে আর একটি কথা আমি আপনাদের বলতে চাই। কাছে থাকা এবং চেনা আলাদা। মার্ক্স-এঙ্গেলস কাছাকাছি ছিলেন। দুজনেই দুজনকে চিনেছিলেন জ্ঞানের চোখে। যদিও এঙ্গেলসের এ নিয়ে বক্তব্য আছে। এঙ্গেলসকে বলা হয়েছিল, 'আপনি তো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নিয়ে অনেক বই লিখেছেন, তা হলে আপনি মার্ক্সবাদ বলছেন কেন?' এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'মার্ক্স অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন। আমরা অত দূর পর্যন্ত দেখতে পেতাম না। আমি যা লিখেছি দু-একটা সায়েন্সের বই বাদ দিলে মার্ক্স সবই লিখতে পারতেন, কিন্তু মার্ক্স যা লিখেছেন, আমি পারতাম না।'

এঙ্গেলস বলেছেন, "হি ওয়াজ জিনিয়াস, উই আর অ্যাট বেস্ট ট্যালেন্টেড"। এঙ্গেলস কয়েকবার এ কথা বলে গেছেন। এই ভাবেই এঙ্গেলস মার্ক্সকে ঠিক চিনেছেন। আবার মার্ক্স-এঙ্গেলসকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা ঠিক চিনতে পারেননি। চিনেছেন লেনিন। লেনিনের সাথে মার্ক্স-এঙ্গেলসের দেখা হয়নি। আবার লেনিনের আশপাশে যাঁরা ছিলেন— কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, ট্রটস্কি— তাঁরা লেনিনকে চিনতে পারেননি, চিনতে পেরেছিলেন স্ট্যালিন। স্ট্যালিন থাকতেন সাইবেরিয়ায়, নির্বাসনে। স্ট্যালিনের সাথে লেনিনের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় বিপ্লবের সময়। তার আগে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু স্ট্যালিন সঠিক ভাবে চিনতে পেরেছিলেন লেনিনকে। আবার কমরেড শিবদাস ঘোষ চিনেছেন মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-কে। কাছে থাকা বা দূরে থাকা— এটা বিষয় নয়। কাছে থাকলেই সবটা চেনা যাবে ব্যাপারটা এ রকম নয়। চেনার জন্য চাই জ্ঞানের চোখ। এক্সটারনাল কন্ট্রাডিকশন, ইন্টারনাল কন্ট্রাডিকশন দুটোই চেঞ্জের একটা ফ্যাক্টর। এক্সটারনাল কন্ট্রাডিকশন কন্ডিশন ফর চেঞ্জ, ইন্টারনাল কন্ট্রাডিকশন বেসিস ফর চেঞ্জ। কিন্তু বস্তুজগতে যেমন করে ঘটে, প্রকৃতিজগতে যেমন করে ঘটে, মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটে না। মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের মন কাজ করে। এক্সটার্নাল থেকে আমি কী নেব আর নেব না, সেটা মন ডিসাইড করে। কতটা নেব, কতদূর নেব এটা কাছে থাকা, দূরে থাকার উপর নির্ভরশীল নয়। একটা মানুষ তার এক্সটারনাল পরিবেশ পরিবর্তন করতে পারে। এখানে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে, অন্য জায়গায় স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য চলে যাচ্ছি। এক্সটারনাল পরিবেশ আমি পাল্টে দিলাম স্বাস্থ্যের জন্য। তাই কত দিন পার্টিতে আছি, কত দিন কাছে ছিলাম, কার কাছে ছিলাম— এর উপরে পারা, না-পারা নির্ভর করে না। কী ভাবে নিচ্ছি, আমার মন কী ভাবে নিচ্ছে, নেওয়ার জন্য কী সংগ্রাম করছি, কী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করছি, এর উপর নির্ভর করে। এর দ্বারা এ কথা আমি বলছি না যে, কমরেড মানিক মুখার্জী কিছু নিতে পারেননি। কিছু যদি নাই নিতে পারতেন, তা হলে এ ভূমিকা পালন করতে পারলেন কী করে? আবার এই আক্ষেপটা থাকাও স্বাভাবিক। কমরেড শিবদাস ঘোষের যে বিশালতা, গভীরতা, ব্যাপকতা, তার কাছে পৌঁছানো অনেক কঠিন ছিল। এই সংগ্রামে তিনিও লিপ্ত ছিলেন, আমরাও লিপ্ত আছি, আপনারাও লিপ্ত আছেন। এরই উপর নির্ভর করছে কে কতটা এগোতে পারব। ফলে তাঁর এই বক্তব্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

কমরেড মানিক মুখার্জীর এই বিশাল কর্মকাণ্ড আপনারা শুনলেন, অথচ তাঁর দিক থেকে তিনি কী আক্ষেপটাই রেখে গেছেন! এই আক্ষেপটাই আবার এগিয়ে চলার সোপান। শিবদাস ঘোষকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, আরও জানতে হবে, আরও বুঝতে হবে। স্ট্যালিনকে জানতে হবে, মাও সে তুংকে জানতে হবে, লেনিনকে জানতে হবে, মার্ক্স-এঙ্গেলসকে জানতে হবে। এই জানা, বোঝা এটাই তো আমাদের অগ্রগতির সংগ্রাম। সেই শিক্ষাটাও কমরেড মানিক মুখার্জী এখানে রেখে গেছেন। এখানেই শেষ করলাম।

গণদাবী-র নতুন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com